Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

ডকেট নং- তাং-

(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)

মহাপরিচালক

"সিলেটের মণিপুরি শাড়ি"

GI Journal No. 36

Published on : 02 JUL 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদন পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ, এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপ্রত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৪৬
আবেদনের তারিখ: ২১-০৬-২০২৩ খ্রিঃ

ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য "সিলেটের মণিপুরি শাড়ি" যা শ্রেণি ২৪ ও ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "সিলেটের মণিপুরি শাড়ি"।

শ্রেণিঃ ২৪ ও ২৫

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) ঠিকানা ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭— ৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ সিলেটের মণিপুরি শাড়ি ও টেক্সটাইল ফেব্রিক্স (২৪ ও ২৫)

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

সবুজে ঘেরা আঁকাবাঁকা পাহাড়ের চা বাগানে ঢাকা পাহাড়ি ঝরণা ধারা বয়ে চলে এমন এলাকায় মণিপুরি তাঁতিদের বসবাস। তাঁতিদের বুননে সিলেটের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। মণিপুরি তাঁতে কি ধরনের কাপড় বোনা হবে সেটা বেশির ভাগ সময় স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারসহ অন্যান্য জেলায় মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাসের ইতিহাস ৩০০ বছরের পুরনো। ধারণা করা হয় মণিপুরি "ইন্নাফ" (ওড়না) থেকে ১২ হাতের শাড়ি বোনা শুরু করেছিলেন মণিপুরি নারী তাঁতিরা। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এবং মাছিমপুরে মণিপুরি নৃগোষ্ঠী এই শাড়ি বোনা শুরু করেন। মণিপুরি শাড়ির রং ও নকশা দেখলেই বোঝা যায় এটি মণিপুরি শাড়ি। 'মণিপুরি শাড়ি' এর সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সিলেটের মণিপুরি শাড়ির স্পেসিফিকেশন

১।	শাড়ির দৈর্ঘ্য	:	৫.৫০ মি. ৬.৪০ মি.(ব্লাউজসহ)
২।	বহর	:	১.০২-১.১৯মি.
৩।	আঁচলের দৈর্ঘ্য	:	০.৩৯-১.০২ মি.
৪।	টানা সুতার কাউন্ট	:	কটন: ৬০স - ৮০স ইংলিশ কাউন্ট পলিয়েস্টার: ৮৮ - ১০৮ ডেনিয়ার সিল্ক: ৪০ - ৫০ ডেনিয়ার
৫।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	কটন: ৬০স - ৮০স ইংলিশ কাউন্ট পলিয়েস্টার: ৮৮ - ১০৮ ডেনিয়ার সিল্ক: ৪০ - ৫০ ডেনিয়ার
৬।	গ্রাউন্ডে সুতার কাউন্ট	:	কটন: ৬০-১২০ ইংলিশ কাউন্ট (২ প্লাই) সিল্ক: ২০-২২ ডেনিয়ার (২/৪/৫ প্লাই)
৭।	সানার নম্বর	:	৪৪-১০০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)

৮।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	০২
৯।	এন্ডস/ইঞ্চি	:	৪৪-১০০
১০।	পিকস/ইঞ্চি	:	৩৮-১০০
১১।	অতিরিক্ত টানা সুতার ব্যবহার	:	জরি/আর্টিফিসিয়াল সিল্ক
১২।	অতিরিক্ত টানা সুতার কাউন্ট	:	৪০ - ৫০ ডেনিয়ার (সিল্ক-২/৪/৫ পল্টাই বা জরি-২ সুতা/ডেন্ট)
১৩।	অতিরিক্ত টানা সুতার ব্যবহার	:	জরি/আর্টিফিসিয়াল সিল্ক
১৪।	অতিরিক্ত পড়েন সুতার কাউন্ট	:	পলিয়েস্টার: ৮৮ - ১০৮ ডেনিয়ার
১৫।	শাড়ির ওজন	:	৩০০-৭০০ গ্রাম

চ) ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নাম (এর বিস্তারিত তথ্য): 'সিলেটের মণিপুরি শাড়ি'

বৃহত্তর সিলেট জেলার সৃষ্টি হয় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরগনা সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে একটি District বা জেলা প্রশাসন নামক প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন এর সময় বৃহত্তর সিলেট জেলাকে ০৪ (চার) টি নতুন জেলায় বিভক্ত করা হয়। এই নতুন জেলাগুলো হলো: সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

সিলেটের মণিপুরি শাড়ি ঃ

পাহাড়ের চা বাগানে ঢাকা পাহাড়ি ঝরণা ধারা বয়ে চলে এমন এলাকায় মণিপুরি তাঁতিদের বসবাস। তাঁতিদের বুননে সিলেটের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারসহ অন্যান্য জেলায় মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাসের ইতিহাস ৩০০ বছরের পুরনো। ধারণা করা হয় মণিপুরি "ইন্নাফ" (ওড়না) থেকে ১২ হাতের শাড়ি বোনা শুরু করেছিলেন মণিপুরি নারী তাঁতিরা। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এবং মাছিমপুরে মণিপুরি নৃগোষ্ঠী এই শাড়ি বোনা শুরু করেন। মণিপুরি শাড়ির রং ও নকশা দেখলেই বোঝা যায় এটি মণিপুরি শাড়ি।

সিলেটের মণিপুরি শাড়ির বৈশিষ্ট্য ঃ

১. মণিপুরি শাড়ির বুনন দক্ষতা এবং বুনন শৈলী মণিপুরি সম্প্রদায়ের নিজস্ব। এ মনিপুরি শাড়ির বুননের মূল কাজ একবারেই আলাদা ও অনন্য।

২. মণিপুরি শাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য হলো জমিনের রঙ থেকে পাড়ের রঙ গাড় থাকে। এর দুই পাড়ে মন্দিরের প্রতিকৃতি থাকে। প্রতিটি শাড়ির আঁচল, পাড় এবং জমিন তৈরি হয় উজ্জল রঙের সুতা দিয়ে।

৩. শাড়ির ডিজাইন হাতে বোনার কারনে দুপাশের ডিজাইন সমান থাকে এবং এপিঠ ওপিঠ দুপাশেই পরা যায়।

৪. মণিপুরি শাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট হলো এর টেম্পল এবং মৈরাং পাড় আর জমিনে জাল বুনন এবং

৫. মণিপুরি শাড়ি জাল বুননের হওয়ার ফলে বাতাস চলাচল করতে পারে বলে শাড়িগুলো খুবই আরামদায়ক।

সিলেটের মণিপুরি শাড়ি ও ড্রেস ঃ

মণিপুরিদের শাড়ি বুননের প্রক্রিয়া অনেকটা জামদানি শাড়ির মতোই। কোনো প্রকার মেশিনের ব্যবহার হয় না এই শিল্পে। মণিপুরিদের উৎপাদিত তাঁত পণ্যের মধ্যে আরও রয়েছে ফানেক, শাল, ওড়না, থ্রি পিস, গামছা, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর ইত্যাদি। এখন তারা অত্যন্ত সুন্দর নকশী কাঁথা এবং বকুল কাঁথাও তৈরি করে থাকে।

সিলেটের মণিপুরি নকশার প্রকার ঃ

মণিপুরি শাড়িতে যে নকশা করা হয় সেগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় ডিজাইন হচ্ছে :

১. ঝাউ গাছ
২. শিউলি ফুল
৩. মন্দিরের নকশা
৪. পায়রা
৫. শাপলা ফুল ইত্যাদি

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

বৃহত্তর সিলেট জেলার সৃষ্টি হয় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরগনা সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে একটি District বা জেলা প্রশাসন নামক প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন এর সময় বৃহত্তর সিলেট জেলাকে ০৪ (চার) টি নতুন জেলায় বিভক্ত করা হয়। এই নতুন জেলাগুলো হলো: সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার। ১৯৯৫ সালের ১ আগস্ট সিলেট দেশের ষষ্ঠ বিভাগ হিসেবে মর্যাদা পায় এবং মূলত বৃহত্তর সিলেট জেলার সীমানাই নতুন সিলেট বিভাগের আওতাভুক্ত করা হয়।

২। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারসহ অন্যান্য জেলায় মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাসের ইতিহাস ৩০০ বছরের পুরনো। ধারণা করা হয় মণিপুরি "ইন্নাফি" (ওড়না) থেকে ১২ হাতের শাড়ি বোনা শুরু করেছিলেন মণিপুরি নারী তাঁতিরা। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এবং মাছিমপুরে মণিপুরি নৃগোষ্ঠী এই শাড়ি বোনা শুরু করেন। মণিপুরি শাড়ির রং ও নকশা দেখলেই বোঝা যায় এটি মণিপুরি শাড়ি। কারণ মণিপুরি শাড়ি মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর নকশায় টেম্পল বা মন্দিরের প্রতি কৃতি থাকবে। তাই প্রায় প্রতিটি মণিপুরি শাড়ির আঁচল, জমিন ও পাড়ের নকশায় দেখা যাবে এ প্রতিকৃতি। আরেকটি বিশেষ দিক হলো-মণিপুরি শাড়ি তৈরি হয় বরাবরই উজ্জ্বল রঙের সুতায়। আর এ সুতাগুলো দেশি সুতা ও একটু মোটা মানের। তাই শাড়িগুলি হয় একটু ভারী ও একটু অমসৃণ। অন্য শাড়ির পাড় বিভিন্ন ধরনের হলেও মণিপুরি প্রায় সব শাড়ির পাড়ই চওড়ায় এক থেকে দুই ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং এক রঙের। এ ছাড়া পাড়ের রং প্রায় সব সময় জমিনের রঙের বিপরীত হতে দেখা যায়। আঁচল, জমিন ও পাড়ে মন্দিরের প্রতিকৃতির পাশাপাশি আঁচল ও জমিনে বিভিন্ন নকশা থাকে। যেমন-গোলাপ ফুল, জবা ফুল, শিউলি ফুল, রেখাসহ বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি। অনেক আগে থেকেই এসব নকশার প্রচলন আছে তা এখনো চলছে। মণিপুরি শাড়ি যতই ঠাসা বুননের হোক না কেন সেই শাড়ি দেখতে কিছুটা মশারির মতো ফাঁকা একটা ভাব রয়েই যায়। অনেকেই একারণে মণিপুরি শাড়িকে জাল বা ফাসা বুনন বলে থাকেন।

৩। মণিপুরি শাড়িতে রংয়ের ভিন্নতা রয়েছে, গাঢ় রং এর পাশাপাশি হালকা রংয়ের শাড়িও তৈরি করা হয়। শাড়িতে বিভিন্ন কালারের সাথে সাদা রং এর সুতার কম্বিনেশন বেশি হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর একটা প্রভাব রয়েছে। বৃহত্তর সিলেট সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ধারে ; তাই সেখানকার পানি, বাতাসের আর্দ্রতার একটা প্রভাব রয়েছে। মণিপুরি শাড়ি যেহেতু হাতে বোনা হয় তাই শাড়ি নরম হয়। তবে কারিগরি দক্ষতা এখানে বিশেষ অবদান রাখছে।

মণিপুরিদের বস্ত্র তৈরি তাঁত কলের নাম হচ্ছে-কোমরে বাঁধা তাঁত ও ফ্রেম তাঁত। এগুলো বাঁশ/কাঠ ও দড়ি দিয়ে হাতেই বানানো হয়। আর তাঁত যন্ত্র পুরোপুরি পরিবেশ বান্ধব। কোন ধরনের কার্বন নিঃসরণ করে না। এই তাঁতগুলো দিয়ে সাধারণত টেবিল ক্লথ, স্কার্ফ, লেডিস চাদর, শাড়ি, তোয়ালে, মাফলার, গামছা, মশারি ইত্যাদি ছোট কাপড় তৈরি হয়। দু'জন তাঁতি মিলে একটা শাড়ি বোনে। একটা শাড়ি বুনতে ৪/৫ দিন সময় লাগে। বেশি ভারি বা ঘন কাজের শাড়ি বুনতে ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগে।

মণিপুরি শাড়ি সাধারণত সুতি ও পলিয়েস্টার সুতায় বোনা হয়। নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রের পুরনো সুতা থেকে শাড়ি বোনার অতীত ইতিহাস রয়েছে মণিপুরি তাঁতিদের। তবে এই শাড়ির ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাঙালি নারীদের মাঝেও। তাই উৎপাদন চাহিদা বেড়েছে। এখন নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রের পুরানো সুতা (রি-সাইকেল) দিয়ে শাড়ি তৈরি করে চাহিদা মেটানো অসম্ভব হওয়ার কারণে তারা স্থানীয় বাজার থেকেও সুতা সংগ্রহ করে এবং শাড়ি বোনে।

সুতা তাঁতে বসানোর আগে তাঁতিদের সুতা প্রসেস করতে হয়। কখনো তারা স্থানীয় বাজার থেকে সরাসরি রঙিন সুতা কিনে আনেন, আবার কখনো রং করার কাজ নিজেরাই করেন। এই রঙিন সুতায় মাড় দিয়ে রোদে শুকিয়ে চরকিতে ঘুরিয়ে সুতা মসৃণ এবং চিকন করে এরপর তাঁতে বসাতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেরা তুলা থেকে সুতা তৈরি করে। শাড়ির সুতায় ক্যামিকেল ডাই এবং প্রাকৃতিক ডাই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সুতি সুতায় ন্যাচারাল ডাই হত ১৯৯০ এর দশকে সেই রং তৈরি হত প্রাকৃতিক ফুল ফল থেকে।

মণিপুরি তাঁতিদের হাতে বোনা তাঁতের বুনন এবং নকশার বিশিষ্টতার কারণেই মণিপুরি শাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। মণিপুরি সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৫ ভাগ নারী তাঁতি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বলা হয় মণিপুরি নারীরা জন্মসূত্রেই তাঁতি। মণিপুরি নারীরা ছোট বেলা থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেদের ঘরের তাঁতে কাপড় বুনে থাকে। পুরুষরা প্রায় তাঁতের সাথে জড়িত থাকে না বললেই চলে। তবে পুরুষরা সুতা কিনে আনা, সুতা প্রসেস করা এবং অন্যান্য কাজে সাহায্য করে। মণিপুরিদের তাঁত শিল্পই মূলত তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান খাত।

জ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

সবুজে ঘেরা আঁকাবাঁকা পাহাড়ে চা বাগানে ঢাকা পাহাড়ি ঝরণা ধারা বয়ে চলে এমন এলাকায় মণিপুরি তাঁতিদের বসবাস। তাঁতিদের বুননে সিলেটের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। মণিপুরি তাঁতে কি ধরনের কাপড় বোনা হবে সেটা বেশির ভাগ সময় স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নিভর করে।

বৃহত্তর সিলেটের সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, বড়লেখা, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও জুড়ী উপজেলা এবং সুনামগঞ্জের ছাতকে মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। এসব এলাকার প্রায় সব সম্প্রদায়ের মণিপুরিরা তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত।

অধিক পরিমানে মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন এলাকা/অঞ্চল

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর, তিলকপুর, মাধবপুর, মঙ্গলপুর গ্রামে মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন হয়। জুড়ি উপজেলার পূর্ব জুড়ি ইউনিয়ন, কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়ন এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় আশিদ্রোনে সবচেয়ে বেশী মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন করা হয়।

অল্প পরিমাণে মণিপুরি শাড়ির উৎপাদন এলাকা

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর মণিপুরি অধ্যুষিত এলাকায় মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন করা হয়। এলকাগুলো হচ্ছে শিবগঞ্জের সেনপাড়া ও আদিত্যপাড়া, কুশিঘাট, নীপবন, আম্বরখানা, বড় বাজার, সুবিদ বাজার, মণিপুরি রাজবাড়ি, লালা দিঘীর পাড়, সাগর দিঘীর পাড়, বাগবাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া হবিগঞ্জসহ যেসব এলাকায় মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসবাস সেখানেও মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন করা হয়। গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ এলাকায় তৈরী হয় এই শাড়ি।

চিত্র : সিলেটের মণিপুরি শাড়ি উৎপাদন এলাকা :

ঋ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল)

মণিপুরি নৃত্যের মতো মণিপুরি তাঁত ও বয়নশিল্প খুবই প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। ১৯১৯ সালে সিলেট সফরের সময় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে মণিপুরি নৃত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। কবিকে মণিপুরি নৃত্যের পাশাপাশি সেদিন মণিপুরিদের বয়নশিল্পও মুগ্ধ করেছিল।

গত ৬ আগস্ট, ২০১৯ সালে দৈনিক প্রথম আলো প্রত্রিকায় প্রকাশিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার লেখক ও গবেষক কুঙ্গ থাঙ তাঁর মণিপুরী শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার এবং রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন "১৯১৯ সালের ৫ নভেম্বর, দিনটি ছিল বুধবার। খুব ভোরে সিলেটে পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। সুরমা নদীর ঘাট থেকে কবিকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে শোভাযাত্রাসহ সিলেট শহরে আনা হয়। তিনি উঠেছিলেন শহরের নয়াসড়ক টিলার ওপরে ফাদার টমাসের বাংলোয়। বাংলোর দরজা-জানালার পর্দাগুলো ছিল মণিপুরি কোমরতাঁতের তৈরি। গবেষক নৃপেন্দ্রলাল দাস তাঁর লেখায় প্রত্যক্ষদর্শী সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'বাংলোর বহির্দ্বারে টাঙানো ছিল মণিপুরিদের তৈরি প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো একখানা আচ্ছাদন বস্ত্র। স্থানান্তের থেকে পর্দা খানা আনীত হয়েছিল। ওই আচ্ছাদন বস্ত্রে মণিপুরিদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে কবি মুগ্ধ হলেন।' তাঁকে পর্দাটি শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।"[১]

এছাড়া উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী তাঁত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন——

'বহুমানভাজনেষু,

মহারাজ, বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে-পাঠাইয়াছেন সে জন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরি শিল্প কার্য শিখিতে ঔসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ নিজের হাতে করিতে অভ্যাস করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা। এই জন্য আসাম হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী এখানকার মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতেছে। কিন্তু শিলেটে (সিলেট) আমি মণিপুরি মেয়েদের যে কাজ দেখিয়াছি তাহা ইহার চেয়ে ভালো। আমি বুদ্ধিমন্তের নিকট আমার প্রস্তাব জানাইয়াছি। সে মহারাজের সম্মতি পাইলেই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া এখনকার মহিলাদিগকে মণিপুরি নাচ ও শিল্পকার্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এইরূপ বলিয়াছে। এ জন্য এ সম্বন্ধে মহারাজের সম্মতি ও আদেশের অপেক্ষায় করিয়া রহিলাম। ভগবান আপনার কল্যাণ করুন এই কামনা করি।[১]

ইতি
১৯ মে মাঘ ১৩২৬
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

লেখক এ.কে শেরাম তাঁর বাংলাদেশের মণিপুরী: ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেনী সঙ্গমে উল্লেখ করেছেন "মণিপুরী মেয়েরা সংসারের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি অনেক অর্থকরী শ্রমেও নিয়োজিত রাখেন নিজেদের। এমনি একটি কাজ হলো বস্ত্রবয়ন। মণিপুরী মেয়েরা নিজেদের পড়নের কাপড় 'ফানেক', ওড়না জাতীয় কাপড় 'ইন্নাপি' এবং গামছা জাতীয় নিত্য ব্যবহার্য কাপড় চোপড় নিজেরাই দেশী তাঁত 'য়োংখাম' বা 'পাংয়োং এ বানিয়ে থাকেন। মণিপুরী তাঁতে বাসানো বিছানা চাদর, খেস, শাড়ি, টেবিল ক্লথ, সাইড বেগ ইত্যাদি বর্তমানে বানিজ্যিকভাবে তৈরী এবং বাজারজাত করা হচ্ছে। মণিপুরী খেস তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও। এছাড়া মণিপুরী তাঁতে মাছ ধরার জালও প্রচুর পরিমাণে তৈরী এবং বাজারজাত করা হয়।"[২] এছাড়া উল্লিখিত বই এ বস্ত্রবয়নে মণিপুরী মেয়েদের দক্ষতা বিষয়ে ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিত কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩২৬ বঙ্গাব্দে লিখিত পত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

লেখক এ কে শেরাম রচিত মণিপুরি মঞ্জুষা বইয়ে তিনি মণিপুরি বয়নশিল্প সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলাদেশে মণিপুরিদের বসতিস্থাপনের ব্যাপ্তিকাল প্রায় কয়েকশত বৎসরের.....
মণিপুরি নৃত্যের মতো মণিপুরি বয়নশিল্পও খুবই প্রাচীন। মণিপুরি বয়ন শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দী থেকেই মণিপুরি বয়নশিল্পের সূত্রপাত বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণাদি না পেলেও এটা নিশ্চিত যে, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দির দিকে এসে মণিপুরি বয়নশিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[৩]

কাজেই সিলেটের মণিপুরি শাড়ির ব্যবহার কাল ১৯১৯ সাল বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঞ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

গবেষক ও লেখক শাওন আকন্দ রচিত "বাংলাদেশের তাঁত শিল্প" বই এ উল্লেখ করা হয়েছে "কোমর তাঁত হচ্ছে মণিপুরি সম্প্রদায়ের আদি তাঁত। তবে কোমর তাঁতের পাশাপাশি বেশ কিছু দিন ধরে এরা বিশেষ ধরনের ফ্রেম তাঁতেও বস্ত্র বয়ন করে আসছে। এই ফ্রেম তাঁত দুই ধরনের হুইল ছাড়া ও হুইলযুক্ত। কাঠ অথবা লোহা উভয় ধরনের উপকরণ দিয়ে এই ফ্রেম তাঁত বানানো যায়। তবে কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কাঠের এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলায় কাঠ ও লোহা উভয় ধরনের উপকরণের তৈরি ফ্রেম তাঁতের প্রচলন রয়েছে। হুইল ছাড়া ফ্রেম তাঁত বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি সরল ধরনের যন্ত্র। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতেই-মণিপুরি সম্প্রদায়ের উভয় শাখায় এ ধরনের সরল ফ্রেম তাঁতের প্রচলন রয়েছে। ফ্রেম তাঁতে কাজ করলেও অধিকাংশ পরিবারে আজও কোমর তাঁতে কাজ হয় অল্প বা বেশি মাত্রায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতেইদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য থাকার কারনে তাঁতযন্ত্র এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নামের পার্থক্য রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া কোমর তাঁতকে বলে 'আতর তাঁত' (আত>হাত) এবং ফ্রেম তাঁতকে বলে 'চীনা তাঁত'। মৈতেরা কোমর তাঁতকে বলে জংঘম এবং ফ্রেম তাঁতকে বলে ইয়ং বা পাইজং।"[৪]

মণিপুরি ভাষায় তাঁতকে বলা হয় ইয়োং। ইয়োং দুই ধরনের হয়। ১. মোয়াং ও ২. পাং

১. মোয়াং: সাধারণত মোটা সুতার কাপড় তৈরী হয় মোয়াং তাঁত।
২. পাং: পাং তাঁতে চিকন সুতার কাপড় তৈরী হয়।

মণিপুরি শাড়ি বুননের জন্য তাঁতে দু'জন তাঁতি কাজ করে। দুদিকে দুজন বসে। প্রথমে সুতায় মাড় দিয়ে শুঁকাতে হয়। তারপরে শুঁকনা সুতা চরকায় পেঁচিয়ে গুটলিতে ভরে সেখান থেকে মাকুতে নিয়ে বুনতে হয়। একটি নরমাল রেঞ্জের মণিপুরি শাড়ি বুনতে ৫ থেকে ৬ দিন সময় লাগে। আর ডিজাইনভেদে ১৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত ও সময় লাগে।

বর্তমানে মণিপুরিদের তাঁত বিভিন্ন রকমের হয়। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. ঝুলন্ত তাঁত

২. ফ্রেম তাঁত

৩. পিট তাঁত ও

৪. কোমড় তাঁত অন্যতম।

মণিপুরি তাঁত যন্ত্রটি মূলত সামগ্রিক অর্থে অনেকগুলো যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের একটি সমষ্টি। তাঁত যন্ত্রটির প্রধান প্রধান যন্ত্র বা স্থুল অর্থে যন্ত্রাংশ হলো ঃ

১. বেঙ, ২. চিনা, ৩. যতর, ৪. নাতু, ৫. উটং, ৬. নেশি, ৭. তেরেং, ৮. নানতুম, ৯. নানচাক, ১০. সেন্নাম, ১১. খুত, ১২. কন্নাপা, ১৩. সেঁতু, ১৪. ঙাকাশুক, ১৫. খরমেত, ১৬. মোম, ১৭. সিনত, এবং ১৮. পালং

ফ্রেম তাঁত দিয়ে সাধারণত বিভিন্ন রকমের শাড়ি তৈরি করা হয়। শাড়ি বুননের পর এগুলোকে আরো টেকসই ও আকর্ষণীয় করার জন্য মণিপুরি নারীরা এগুলোতে সেলাইয়ের মাধ্যমে ফুল, পাতা, বিভিন্ন প্রাণী ও জ্যামিতিক নকশা তোলে। পরবর্তীতে এগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রোদে শুঁকানো হয়। মণিপুরি শাড়ি বয়নের ধাপসমূহ

নিম্নরূপ ঃ

১. রঙ্গিন সুতো সংগ্রহ, ২. মাড়করণ, ৩. ববিনকরণ, ৪. টানা সুতা ড্রামে জড়ানো, ৫. টানা সুতার বিমে জড়ানো, ৬. 'ব' গাঁথা ও সানা গাঁথা ৭. টানা সুতার বিম তাঁতে স্থাপন ৮. কাপড় বুনন।

গবেষক শাওন আকন্দ রচিত বাংলাদেশের তাঁত শিল্প বই এ উল্লেখ করা হয়েছে "মণিপুরি তাঁতবস্ত্রের ডিজাইন বেশ সরল কিন্তু নান্দনিক। মণিপুরি নারীরা উৎসবে ব্যবহার করে চাকছাবি/লেইফানেক, ইনাফি। চাকছাবি/লেইফানেক মূলত থামির মতো শরীরের নীচের অংশে পরিধেয়। এর জমিনে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়। লাল, গোলাপী রংয়ের আধিক্য থাকে। এতে চেক ডিজাইন করা থাকে। চাকছাবির পাইড়ে হাতে করা বেশ ভারী নকশা থাকে। মূল নকশাটির নাম "গিল্টা" । এটি ডিম্বাকার। এর ভিতর লতাজাতীয় নকশা থাকে। গিল্টার ওপরে এবং নিচে পাড়ের প্রান্তে থাকে 'কানি'। এটি সাধারণত বরফি ধরনের হয়ে থাকে। গিল্টার পাশে থাকে "তংকাপ"। এটি জ্যামিতিক অর্ধত্রিভূজাকার। পুরো পাইড়জুরে গিল্টা, কানি ও তংকাপের ধারাবাহিকতা থাকে। ইনাফি হচ্ছে নারীদের ব্যবহৃত উর্ধ্ববাস। এটি মূলত সুতির তৈরি ওড়না বিশেষ।... পুরুষদের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য বস্ত্র পাঁচহাতি/খুদেই মাতেয়েক। এটি চার/পাঁচ হাত দৈর্ঘ্যের বড় গামছার মতো। এটিকে ধুতির মতো করে ব্যবহার করা হয়।"[৫]

সিলেটের মণিপুরি শাড়ি উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপের স্থির চিত্র :

ছবি ১ : মণিপুরি বসতিতে সুতা রং করার পর শুকানো হচ্ছে

ছবি ২: চরকার সুতা কাটছে মণিপুরি তাঁত শিল্পী

ছবি ৩ : টানার তাঁতে সুতা সেট করা শাড়ি বোনা হচ্ছে।

ছবি ৪: সুতা মাকুতে ভরে তাঁতে শাড়ি বোনা হচ্ছে

ছবি ৫ : কেওয়া টেম্পল পাড়ের শাড়ি বুনন চলছে

ছবি ৬: মৈরাং পাড়ের শাড়ি বুনছে এক মণিপুরি তাঁতি

ছবি ৭ : বিশেষ মণিপুরি শাড়ির নকশা আঁকা হয়েছে।

ছবি ৮: বিশেষ নকশার একাডেমির শাড়ি বুনন করছেন

ছবি ৯ : মৈরাং তোলা পাড়ের শাড়ি বুনন হচ্ছে

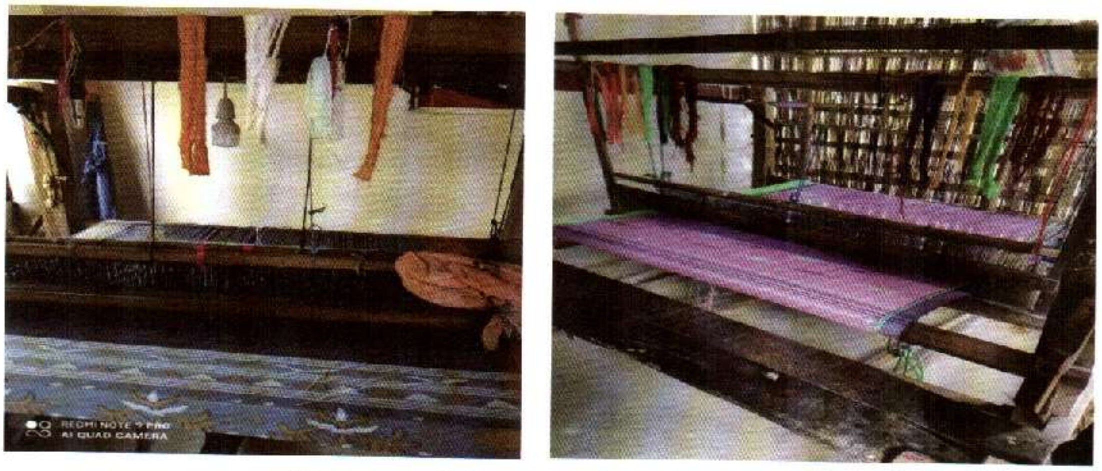

ছবি ১০-১১ ঃ পলিস্টার সুতার মণিপুরি শাড়ি বুনা হচ্ছে।

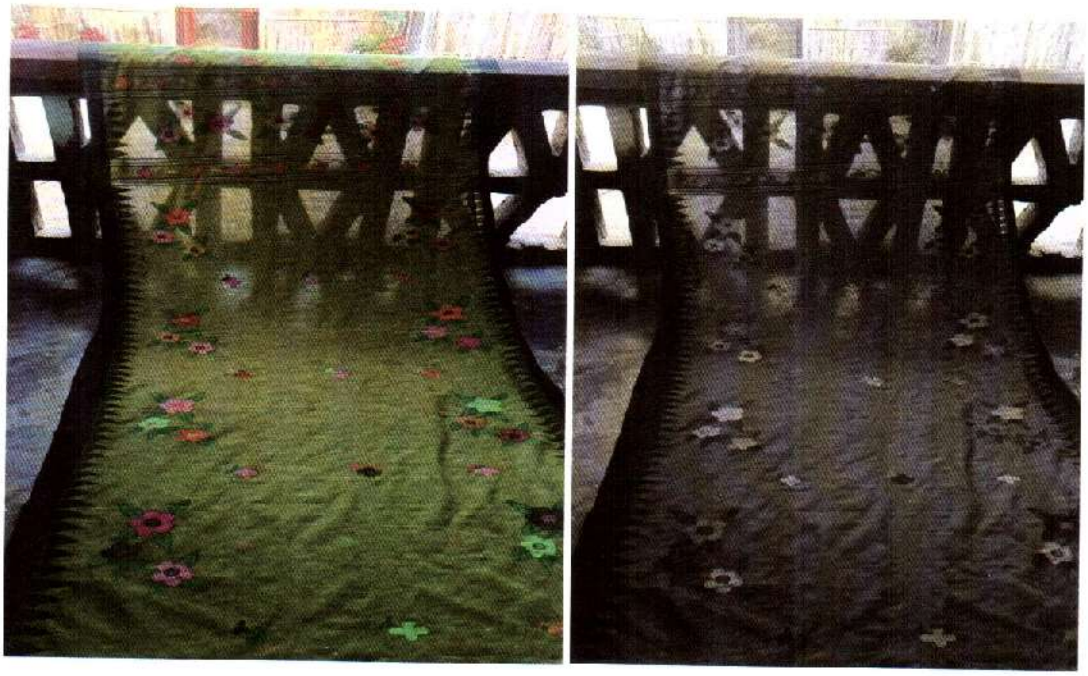

ছবি ১২-১৩ ঃ তাঁত থেকে কাটা এক্সক্লুসিভ মণিপুরি শাড়ি।

ছবি ১৪-১৫ ঃ তাঁত থেকে নামিয়ে একসাথে করে শাড়িগুলো ওয়াশে নেওয়া হয়।

ট) সিলেটের মণিপুরি শাড়ির অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মণিপুরি শাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর নকশায় টেম্পল বা মন্দিরের প্রতিকৃতি থাকবে। তাই প্রায় প্রতিটি শাড়ির আঁচল, জমিন ও পাড়ের নকশায় দেখা যাবে এ প্রতিকৃতি। আরেকটি বিশেষ দিক হলো-মণিপুরি শাড়ি তৈরি হয় বরাবরই উজ্জ্বল রঙের সুতায়। আর এ সুতাগুলো দেশি সুতি ও একটু মোটা মানের। তাই শাড়িগুলো হয় একটু ভারী ও একটু অমসৃণ। অন্য শাড়ির পাড় বিভিন্ন ধরনের হলেও মণিপুরি প্রায় সব শাড়ির পাড়ই চওড়ায় এক থেকে দুই ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং এক রঙের। এ ছাড়া পাড়ের রং প্রায় সব সময় জমিনের রঙের বিপরীত হতে দেখা যায়। আঁচল, জমিন ও পাড়ে মন্দিরের প্রতিকৃতির পাশাপাশি আঁচল ও জমিনে বিভিন্ন নকশা থাকে। যেমন-গোলাপ ফুল, জবা ফুল, শিউলি ফুল, রেখাসহ বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি। অনেক আগে থেকেই এসব নকশার প্রচলন আছে তা এখনো চলছে। মণিপুরি শাড়ি যতই ঠাসা বুননের হোক না কেন সেই শাড়ি দেখতে কিছুটা মশারির মতো ফাঁকা একটা ভাব রয়েই যায়। অনেকেই একারণে মণিপুরি শাড়ি কে জাল বা ফাসা বুননের বলে থাকেন।

ঠ) বাণিজ্যের এলাকা ঃ

সমগ্র বাংলাদেশে মণিপুরী শাড়ির চাহিদা রয়েছে এবং বিক্রি হয়। বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলের রাধানগর এবং সিলেট শহরের লামাবাজার ও জিন্দাবাজার। ঢাকার বিভিন্ন বিপণী বিতানসহ বর্তমানে ই-কমার্সে প্রচুর মণিপুরি শাড়ি বিক্রয় হয়। এছাড়া সিলেট শহরের শিবগঞ্জ এ মণিপুরী শাড়ি বিক্রয় হয়। তাছাড়া, মনিপুরী শাড়িসহ তাঁতজাত পণ্য ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. থাঙ কুঙ্গ. (২০১৯, August 6). মণিপুরি শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার এবং রবীন্দ্রনাথ [Review of মণিপুরি শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার এবং রবীন্দ্রনাথ]. প্রথম আলো. https://www.prothomalo.com/onnoalo/মণিপুরি-শিল্প-সংস্কৃতির-প্রসার-এবং-রবীন্দ্রনাথ

২. শেরাম এ.কে., বাংলাদেশের মণিপুরী: ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে (২০০৬) আগামী প্রকাশনী. পৃ:৬৫-৬৬।

৩. শেরাম এ.কে., মণিপুরি মঞ্জুষা (২০২৩) পৃষ্ঠা ২১৯, ২২০ ;

৪. শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁত শিল্প (২০১৮), পৃ: ৩৪২ ;

৫. শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁত শিল্প (২০১৮), পৃ: ১৮২।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক-১৬৬৩/২০২৩-২০২৪(শিল্প)/-০৬-০৬-২০২৪-২০০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary), Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary), Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.